**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No.518-524
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.239**

# সেলিনা হোসেনের 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধপ্রবণতা ও মাতৃত্ববোধের উত্তরণ

**মোবারক হোসেন,** *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.01.2026; Accepted: 29.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

Selina Hossain is a famous Bangladeshi writer. She was born in 1947 in Rajshahi. Her book 'Ekaler Pantaburi' (2002) contains many short stories. One important story is 'The Lament of Four Young Men.'
The story takes place thirty years after the Liberation War of Bangladesh (1971). It is about four friends who often meet and talk about politics. Bashar is one of them. He is honest and loves his country. Bashar thinks people should not live with the Razakars after the war. The other friends know Bashar is right, but they feel sad and hopeless, so they do not agree with him. When Bashar is with them, they do not feel lonely. But when he goes to Dhaka to study, the others become unemployed and lonely. Slowly, the bad influence of a decaying society turns them into criminals. Their discussions turn on a girl named Mandira, and they talk about her physical beauty. Later, Bashar dies in Dhaka. Mandira goes to console Bashar's mother, which makes the four young men jealous and more frustrated. When Mandira's brother Dilip scolds them for following her, they threaten him. At last, the four young men kidnap Mandira. While taking her away, they hear her mother crying. When they try to harm Mandira near the river, she faints. Hearing her mother's cries, they remember their own mothers and feel guilty. Finally, they return Mandira to her mother and punish themselves for their wrong doing.
**Keywords:** Four young men, Liberation war of Bangladesh, Decaying society, Jealous, Frustrated, Kidnap, Mother crying

একুশ শতকের অন্যতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালে রাজশাহী শহরে। ষাটের দশক থেকেই সেলিনা হোসেনের সাহিত্যের যাত্রাপথ আরম্ভ হয়। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'উৎস থেকে নিরন্তর' (১৯৬৯)। তিনি জীবন সচেতন শিল্পী, তাঁর সাহিত্য সৃজনশীলতায় মানুষ ও মানুষের জীবনের পাশাপাশি নারী জীবনের মাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি মূলত বাস্তব সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে লিখতে ভালোবাসেন। তাই তো তাঁর রচনায় দেশবিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক সংকট ও অবক্ষয়িত সমাজের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণ পরিলক্ষিত হয়। সেলিনা হোসেন এযাবৎকাল প্রায় ১৩ টি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তাঁর কলম এখনও চলমান। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অন্যতম গল্পগ্রন্থ 'একালের পান্তাবুড়ি' (২০০২)। 'একালের পান্তাবুড়ি' গল্পগ্রন্থের মূল বিষয় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রায়ণ । 'একালের পান্তাবুড়ি'

গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প 'চার যুবকের বিলাপ'। আমাদের আলোচ্য 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধপ্রবণতা ও মাতৃত্ববোধের উত্তরণ পরিলক্ষিত হয়।

সেলিনা হোসেনের 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের অর্থাৎ স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। গল্পের রচনাকাল ২০০১ সাল। গল্পের সূচনায় গল্পের কথকসহ চার বন্ধুর আড্ডার কথা উল্লেখিত হয়েছে। চার বন্ধুর আড্ডার আলোচনা মন্দিরা নামে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে। মন্দিরাকে নিয়ে আলোচনার আগে তাদের আড্ডার বিষয়ে রাজনীতি নিয়ে বেশি আলোচিত হতো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ফলে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে চার বন্ধুর অন্তর্নিহিত চরিত্রের ইতিবাচক, নেতিবাচক দিকগুলি আলোচ্য গল্পের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে তাদের নেতিবাচক বিষয়গুলি বা অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধ প্রবণতার দিকগুলি গল্পের মূল বিষয় হয়ে উঠবে। পশ্চিম পাকিস্তানের একটা বড় অংশ ছিল রাজাকার বাহিনী। তাদের ভয়াবহ অত্যাচার পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রবল পরিমাণে বেড়েছিল। ১৯৭১ সালের পর তাদের অত্যাচারের অবসান হয়। বর্তমানে চার যুবক বা চার বন্ধুর মূল আলোচনার বিষয় স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর রাজাকারদের আর রাজাকার বলবে কিনা, কোন যুগে রাজাকাররা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। মহিলাদের ধর্ষণ করেছিল পাকিস্তান রক্ষার নামে। অনেক মানুষদের খুনও করেছিল এখন সবকিছু চার বন্ধুর কাছে অলীক ভাবনায় পরিণত হয়েছে। চারজনের মত ত্রিশ বছর পরে সব কিছু ভুলে এখন ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকাই উচিত। চার যুবকের মাঝে আরেকটি যুবক ছিল, তার নাম বাশার। বাশার চরিত্রটি আলোচ্য গল্পেরও একটি অন্যতম চরিত্র। সে দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী ব্যক্তি। চার যুবকের উক্ত আড্ডার আলোচনায় যখন রাজাকারদের মান্যতার কথা উঠে আসত তখন বাশার প্রবল বিরোধিতা করত। কারণ বাশারের বাবা ছিল মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। পাকিস্তান আর্মিরা তার বাবাকে বেয়োনেট খুঁচিয়ে মেরেছে। ফলত বাশার সমস্তটা মেনে নিতে পারে না। বাশার যখন তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করত তখন তার কণ্ঠস্বর বদলে যেত। তার কণ্ঠস্বরে চার যুবক চমকে উঠত, ভেতরে কাঁপুনি উঠত সেটা অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু বাশারকে তারা ভয় করত না। বাশার যখন বলত, "তোরা যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিবারের কাউকে শহীদ হতে দেখিস নি তারা বুঝবি না স্বাধীনতা বিরোধীদের জন্য আমাদের ঘৃণা কত প্রবল।"[১] বাশারের কথাশুনে চার যুবকের মাথা নত হয়ে যেত। তাদের মনে হতো 'ও কঠিন সত্য কথা বলছে'। বাশারের চোখ মুখ চেহারা দেখে তারা অনুতপ্ত হতো ক্ষণিকের জন্য। আবার তারা নিজেদের চারিত্রিক স্থানে ফিরে আসত। তাদের আগের ভাবনা ফিরে যেতে দেখে তাদের আড্ডায় আবার বাশার চেঁচিয়ে বলত, "দেশটা যদি স্বাধীন না হতো তাহলে পাকিস্তানীদের জুতা মুছেও ভাত খাওয়ার সুযোগ পেতি না তোরা।"[২] চার যুবক বাশারের প্রতিটি কথায় তারা সমর্থন করত আর বলত যে রূঢ় সত্যি কথায় বলছে কিন্তু তারা মন থেকে মেনে নিতে বা স্বীকার করতে পারত না। তারা বাশারের মধ্যে আলো ফিরে পেলেও অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতো। তাদের মধ্যে সৎসঙ্গ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তারা তাদের আলোচনায় একাকিত্ব দূর করতে পারত। একসময় বাশার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে চলে গেল। চার যুবক পড়াশুনো ছেড়ে বখাটে বেকার যুবককে পরিণত হল। একাকিত্বের যন্ত্রণা দূরীকরণে ধূমপান করে আনন্দ না পাওয়াতেও বাংলাদেশের গাবখানা সেতুতে আড্ডা দিতে লাগল।

বাংলাদেশের ঝালকাঠি শহরের গাবখানা সেতুতে আড্ডারত অবস্থায় সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাদাম খাওয়া চলে। বাদামের খোসা তারা নদীতে ফেলে। তারা জানে যে বাদামের খোসা ফেলে কাজটা ভালো করছে না। বাদামের খোসায় যে নদীর পানিতে আবর্জনা জমে জল দূষিত হবে সে চিন্তা থাকলেও তারা সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকেনা। অবসাদ তাদেরকে গ্রাস করেছে। অবসাদের ফলে পরিবেশ দূষণের চিত্র গল্পকার সেলিনা হোসেনের লেখায় পরিস্ফুটি হয়েছে-

> “তবু আমরা চারজন সেতুর উপরে উঠে দাড়াই। নদী দেখি, নৌকো দেখি, দূরের আকাশ দেখি। আমাদের নিজেদের ভীষণ অবসাদগ্রস্ত মনে হয়। যেন আমরা কত কিছু হারিয়ে ফেলেছি, একটা ভার আমাদের পেয়ে বসে। আমরা বাদাম কিনে চিবুতে থাকি। উপর থেকে বাদামের খোসাগুলো ফেলে দিই নদীতে। আমরা ফেলতে থাকি। এখন আমাদের সঙ্গে বাশার থাকলে বলতো, তোরা হলি গিয়ে জ্ঞান পাপী।”[৩]

চার বন্ধু ঝালকাঠি শহরের ঐতিহ্য বাশারের মুখে শুনে। ঝালকাঠি হল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল বিভাগের একটি জেলা বা অঞ্চল। এটি একটি বড় নদী-বন্দর। একসময় ঝালকাঠি বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসত। একবার রবীন্দ্রনাথের স্টিমার এই বন্দরের থেমেছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি স্কুলের নামকরণও করেছিলেন। এসব ঝালকাঠি শহরের ঐতিহ্যের কথা চার যুবক বাশারের কাছে শুনেছিল। বাশার বাঙালির ঐতিহ্য রক্ষাকারী একজন  চরিত্র। সে ইতিহাস খুঁজতে ভালবাসে। তাইতো ঝালকাঠির ইতিহাস চার যুবকের সামনে বললে উক্ত ঐতিহ্য তাদের কাছে গুরুত্বহীন মনে হয়। ইতিহাসের ঐতিহ্যে তাদের বিশ্বাস নেই। তারা আধুনিক মানুষ হতে চায়। তাদের আধুনিকতা দেখে বাশারের হাসি পেত কারণ আধুনিক মানুষ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। বাশারের মা ছিল স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। বাসারের মামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াত। বাশার তাদের সমন্বয়ে বেড়ে উঠেছে। বাশারের সমস্ত জ্ঞান-গরিমা ও সুশৃঙ্খলতা দেখে চার যুবকের ঈর্ষা হত। তারা মনে করে ঈর্ষারও কারণ আছে। তারা মনে করে তাদের কাজ না থাকার কারণে এবং একজন শহীদের ছেলে বলে বাশারকে তারা ঈর্ষা করে। তাই তো তারা বাশারের ইতিবাচকতা সমর্থন করলেও তারা মেনে নিতে না পেরে নিজের অবস্থানে ক্ষনিকের মধ্যে ফিরে এসে অবসাদে ভোগে। চার যুবক বেকার, তাদের আর লেখাপড়া হবে না। তারা কিছু করার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠলেও তা করতে পারে না। ছোটখাটো কোনো চাকরি কিংবা ব্যবসা করা তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনোটাই চার বন্ধু ইচ্ছে মতো দাঁড় করাতে পারেনি। চার যুবকের বেকারত্বের চিত্রটি তৎকালীন বাংলাদেশের অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রায়ণ। অবক্ষয়িত সমাজ থেকে চার যুবক ধীরে ধীরে অবসাদে এগিয়ে গেছে। বেকারত্বের ফলে তারা একাকিত্বে ভুগে নারী লোলুপতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আর সেই সময় থেকেই মন্দিরাকে নিয়ে তারা আড্ডায় মেতে ওঠে। বাশার ঢাকা চলে যাওয়ার পর থেকে রাজনীতির আড্ডা ছেড়ে এখন তাদের মন মন্দিরার দেহ সৌন্দর্যের প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আড্ডায় মেতে ওঠা।

বাশারের প্রস্থান ও মন্দিরার প্রবেশ। মন্দিরাকে নিয়ে তাদের দীর্ঘ উপমা চলে দিনের পর দিন। আড্ডায় বসে একজন যদি বলত মন্দিরার হাসি দারুণ, সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন বলত ওর হাসিতে মুক্তো ঝরে। চার যুবকের অবসাদ মনে মন্দিরার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য নিয়ে উপমায় ঝড় বয়ে যেত। যখনই তাদের মনে হত যে তারা কেউই মন্দিরার উপযুক্ত নয় তখনই তাদের মননে প্রতিহিংসা জাগত আর তারা ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত।

চার যুবক মন্দিরার কলেজে যাওয়ারও পথের ধারে দাঁড়িয়ে গুলতানি করার সময় মন্দিরাকে নিয়ে নানান মন্তব্য চালায়। তারাও জানতে পারত যে হে মন্দিরা বিরক্ত হচ্ছে কিন্তু তার বিরক্তির কাছে তাদের আনন্দ প্রবল মনে হতো। মন্দিরার শরীর নিয়ে তাদের নানান মন্তব্য চলত, “আমরা দেখেছি মন্দিরার শরীর এখন দারুন বসন্ত।”[৪] দিনের পর দিন গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাদের বুকে তৃষ্ণা জেগে উঠলে তারা চারজন চায়ের দোকানে সিগারেট টানতে টানতে বলত, “মন্দিরা তুমি আমার হও। আমি জানি এই একটি কথা জলিল, কাদের ও বদরুল মনে মনে বলে। আমরা জানি মন্দিরা আমাদের হবার নয়।”[৫] মন্দিরা চারজনের হবার নয়, তারা নিরুপায়। কারণ মন্দিরা বামুনের মেয়ে। ওরা সাত ভাই বোন। ও সবার ছোট। সবাই মন্দিরাকে আগলে রাখে। গত বছর মন্দিরার বাবা মরে যাওয়াতে চার বন্ধু শ্মশান ঘাটে গিয়েছিল।

মন্দিরার বাবা মরে যাওয়ার কষ্ট অনুভব করতে নয়, তারা গিয়েছিল মন্দিরার অসহায়তার কথা ভেবে। তারপরে তারা অনুভব করেছিল মন্দিরা শান্ত হয়েছে। বান্ধবীদের সঙ্গে আগে অনেক গল্প করতে করতে ফিরত, এখন সেটা ও করে না। মন্দিরার জন্য চার যুবকের নমনীয় ভাব জাগে আর তারা অস্বস্তি বোধ করে। তাদের চারিত্রিক পরিবর্তনে তারা নজর দেয় না। তারা অসদগ্রস্ততার কারণ কোনোদিন পর্যবেক্ষণ করেনি।

মন্দিরার পিছনে পড়ায় মন্দিরার দাদা দিলীপ চার যুবককে আক্রমণ করে। দাদার বক্তব্য মন্দিরাকে জ্বালাতন করলে থানায় ডায়েরি লিখার হুমকি দেয়। চার যুবক দিলীপকেও প্রতি হুমকি দেয়, "আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করলে দেশ ছাড়তে বাধ্য করব।"[৬] চার যুবকের কথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতার কথা উঠে আসে। সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পটিতে দেশবিভাগের পরবর্তী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে দেশ নিয়ে যে একটা রাজনৈতিক মতানৈক্য চলছিল তারই রূপায়ণ বর্নিত হয়েছে। দেশ ছাড়ার হুমকির প্রত্যুত্তরে দিলীপ বলে,

> "কি, কি বললে? আর একবার উচ্চারণ করলে জিভ টেনে ছিড়ে ফেলবো। তোমরা রাজাকারের গোষ্ঠী তোমরা দেশ ছাড়ো। বাপের ভিটা পাকিস্তান যাও আমরা এই দেশের সঙ্গে বেইমানি করিনি আমরা দেশ ছাড়ব না।"[৭]

চার যুবক ও দিলীপের উক্ত কথাগুলির রেষারেষিতে সেলিনা হোসেনের আলোচ্য গল্পে তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুদের একদিকে অধিকার ও অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। দিলীপের কথায় পাকিস্তান বেইমান রাজাকারদের চিত্র পরিস্ফুটি হয়েছে। যারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙ্গালিদের দেশ ছাড়ার বা নিরাপত্তাহীনতায় উঠে পড়ে লেগেছিল তারই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। দিলিপের কথায় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও অধিকারের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মাসখানেক পরে ঢাকার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাশারের মৃত্যু হওয়ার ফলে বাশারের লাশ বাক্সবন্দী হয়ে ঝালকাঠিতে আসে। বাশারের মৃত্যুতে চার যুবক খুব দুঃখ পায়। বাশারের মৃত্যুতে তার মা স্তব্ধ হয়ে যায়, মাঝেমধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেলেও চার যুবক বাশারের মায়ের সামনে যেতে পারেনা। বাশারের মৃত্যুর খবর পেয়ে মন্দিরা আসে বাশারের মাকে সান্ত্বনা জানানোর জন্য। মন্দিরা বাশারের মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে বুকে জড়ানোর মধ্যে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র পরিস্ফুট হলেও চার যুবকের মধ্যে সম্প্রীতি চোখে পড়েনি। তাদের নজরে ঈর্ষা কাজ করেছে। তাইতো তারা দুঃখের মাঝেও ক্রোধ দমন করতে পারেনি, "এত লোক বিশেষ করে অনেক মেয়েরা থাকতে মন্দিরাকে ধরতে হবে কেন তা আমরা বুঝতে পারি না।"[৮] তারা উক্ত দৃশ্য না দেখতে পেরে বাইরে আম গাছটার নিচে এসে পরিকল্পনা করে। শহরে বাশারের হত্যার বিচার চেয়ে লাশ নিয়ে মিছিল আরম্ভ হয়। সেই মিছিলে চার যুবকও সামিল হয় কারণ তাদের বাশারের জন্য অকৃত্রিম ভাবনা ছিল। তারা বাশারকে ভীষণ ভালোবাসত। তারা মিছিলে সামিল হলে এবং বাশারকে ভীষণ ভালবাসলেও জনগণের শ্লোগানে তাদের মন সায় দেয় না। তারা মাথা নিচু করে হেঁটে যায়। তাদের মনোগত ভাবনা তারাকে যারা বখাটে বলে গালি দেয় তাদের কাছে তারা চেহারা স্পষ্ট করতে চায় না। মিছিল শেষে ফিরে এসে তারা আর মন্দিরাকে বাশারের মায়ের কাছে দেখতে পায়নি। মন্দিরা তার মাকে নিয়ে ফিরে আসাতে চার বন্ধু স্বস্তি অনুভব করে। মন্দিরার উপস্থিতিতে চার বন্ধুর ক্রোধ বাড়ে কারণ মন্দিরা যে ভালোবাসা বাশারের মায়ের কাছে পেয়েছে সে ভালোবাসা চার বন্ধু কোনোদিন পায়নি ও পাবে না। বাশারের মা চার বন্ধুকে পছন্দ করত না, তার বাড়িও যেতে পারত না চার যুবক। ফলত সবদিক থেকে তাদের মনে ঈর্ষা জন্মেছে আর সব থেকে বেশি মন্দিরার প্রতি ঈর্ষা জন্মেছে। তাইতো মন্দিরাকে নিয়ে তাদের অবসাদ মনে মন্দিরার শরীরের দিকে অপরাধপ্রবণতার ঝোঁক বেড়ে ওঠে। 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পের অগ্রসরে বাশারের কবরের সমাধি শেষে রিকশায় চড়ে গাবখানা নদীর কাছে

তাদের আগমন হয়। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া না দিয়ে তার প্রতি অত্যাচার করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তাকে তাড়ানোর মধ্য দিয়ে তারা হা হা করে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমরা এভাবেই শহরে বাস করি যেমন খুশি তেমন' যেমন খুশি তেমনের মাঝেই বাশারের সঙ্গে ওঠাবসা ও বন্ধু নিয়ে তাদের চিন্তা চেতনায় প্রশ্ন বিরাজ করে। যে কথাগুলি তাদের অবচেতন মনে জন্মেছিল তার বহিঃপ্রকাশ-

> "আসলে বাশারের সঙ্গে কি আমাদের বন্ধুত্ব ছিল? ও তো আমাদের কেবলই উপদেশ দিতো। এটাকে কি বন্ধুত্ব বলে? আমরা তো জানি বন্ধুত্ব বড় জিনিস। শহরের মাদি-বাচ্চারা ওর হত্যার বিচার চেয়েছে। কে ওর হত্যার বিচার করবে? তেমন মানুষ কি আছে এ দেশে? ওর বাপের হত্যারই তো বিচার হয়নি। অপরাধীরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে ফুঃ। আসলে এমন বালখিল্য বিষয় নিয়ে আমাদের না ভাবলেও চলে।"[৯]

চার যুবক কী বলছে এবং কেন বলছে নিজেরাও জানে না। কখনো বলছে বিচারের প্রয়োজন আবার কখনো বলছে কে ওর বিচার করবে। বিচারের জন্য মিছিলেও পা মেলায় আবার বিচারের বিষয়টি তাদের 'বালখিল্য' মনে হয়। তাদের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে কোনো যুক্তির মিল নেই। অবসাদের প্রত্যেকটি লক্ষণ তাদের মধ্যে বিরাজমান। অবসাদের ফলেই তারা একে অপরের বা পরিশ্রমী ব্যক্তিদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করে। তাদের অপরাধপ্রবণতা বাড়তে থাকে। রিকশাওয়ালার টাকায় তারা বাদামওয়ালাকে ডেকে বাদাম কিনে খেতে যায়। কিন্তু বাদামওয়ালার ঝুড়ি থেকে মুঠে মুঠে  বাদাম তুলে তাকে ভাগিয়ে দেয়। বাদামওয়ালা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলে তাদের ক্ষণিকের জন্য অনুতাপও হয় কিন্তু তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারলেও করতে চায়না। তারা অনুতাপকে ক্ষনিকের জন্যই রাখতে চায়। তাদের অনুশোচনা ক্ষণিকের জন্য। তাদেরই উক্তি,

> "ক্ষণিকের জন্যই আমাদের অনুতাপ হয়। কিন্তু সেটা বড়ই ক্ষনিকের আমরা এসব পাত্তা না দেওয়ার জন্য অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করি।"[১০]

গল্পের রচনাকাল ২০০১ সাল। গল্পের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা উত্তরকালে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা। সময়ের পরিসরে চার যুবকের মন থেকে মন্দিরার ভাবনা দূর হয়েছিল। দুমাস পরে বাংলাদেশে নতুন সরকার অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের প্রবণতা শুরু হয়। ফলত দিলীপ বাবুর ওপর চার যুবকের প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠে। তাদের কাছে সুযোগ এসে দরজায় কড়া নাড়ে। চার যুবক দিলিপের বাড়ি হানা দেয়। তারা আসার আগেই দিলীপ বাবুকে অন্যরা আঘাত হানার ফলে দিলীপের বাকি ভাইয়েরা বাড়িতে ছিল না। সেই সুযোগ বুঝে মন্দিরকে তুলে আনার উন্মত্ততায় মেতে যায়। তারা দিলীপ বাবুকে আঘাত করে এবং মন্দিরাকে তুলে এনে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তোলে। মন্দিরাকে তুলে আনার সময় 'খোলা দরজা পথে শুনতে পাই মন্দিরার মায়ের হাহাকার'। মন্দিরার মায়ের হাহাকার চার যুবকের কর্ণে প্রবেশ করলেও মননে প্রবেশ করে না। মন্দিরা একজন নারী। সে চারজনের কাছ থেকে রেহাই পায় না। তাকে সুগন্ধা নদীর ধারে নিয়ে আসা হয়। তার উপর চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ায় সে অজ্ঞান হয়ে যায়। চার যুবক একসময় টের পায় যে মন্দিরা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তখন তারা তাকে ছেড়ে দেয়। আর তাদের চিন্তা-চেতনায় মন্দিরার মায়ের ভাবনা অনুরণিত হয়ে ওঠে। মন্দিরার মায়ের হাহাকারের কান্না তাদের কানে বাজতে থাকে। কান্নার আওয়াজ বাজতে থাকার ফলে তাদের অপরাধপ্রবণতার মাঝে বোধ-বুদ্ধি ফিরে আসে। তাদের অসহায় মায়েদের কথা মনে হয়, তাদের মায়েরাও যে অসহায়ভাবে পথ চেয়ে বসে আছে একথা মনে হওয়ায় তাদের মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে,

> "ওর মায়ের হাহাকার তখনো আমাদের কানে বাজতে থাকে। আমাদের একবারও মনে হয় না এই হাহাকার আমাদের মায়েদেরও হতে পারতো।"[১১]

হতে পারত কিন্তু হয়নি। যখন অন্যায় হয়ে গেছে তখন তাদের ঘন আনন্দহীনতায় বাড়ি ফেরার সময় একে অপরের বোধ ফিরে আসে, "তাহলে আমরা কাজটি করলাম কেন?"[১২] গল্পের সূচনা থেকে মন্দিরাকে ধর্ষণ করা অবধি চার যুবকের প্রতিটি কাজের কোনো পর্যবেক্ষণ ছিলই না। তাদেরকে অবক্ষয়িত সমাজ ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো চিন্তা-চেতনা ছিল না। তাদেরকে বাশার জাগ্রত করার চেষ্টা করলেও তারা ক্ষনিকের জন্য জেগে উঠে আবার নিজের স্থানে ফিরে আসে। একসময় তাদের আড্ডায় বাশারের প্রস্থান হয় মন্দিরার আগমন হয়। একদিকে তারা অবসাদগ্রস্ত আর অন্যদিকে তারা বেকার। তারা অবক্ষয়িত সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন  বাস্তব জীবনের রূপকার। তাঁর গল্পে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়। আলোচ্য গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালের প্রেক্ষাপটে রচিত। মুক্তিযুদ্ধের পরে তৎকালীন সমাজের মানুষজন যে অবক্ষয়িত সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে এবং নারীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার থেকে শুরু করে সাধারণ পরিশ্রমী মানুষদেরকেও অত্যাচার করেছিল তারই প্রতিকায়িত রূপ আলোচ্য গল্পে বর্তমান। চার যুবকের অপরাধপ্রবণতার মাঝে তাদের মায়েদেরও কথা মনে হয়নি। একটি নিষ্পাপ মেয়ের ধর্ষণে তাদের মায়েদের ও অপর মায়েদের কথা বা মায়েদের হাহাকারের কান্না যখন কানে বাজতেই থাকে তখন আনন্দ ফিকে হয়ে যাওয়ায় মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। মাতৃত্ববোধের জাগরণে তারা গভীরভাবে অনুভব ও অনুশোচনা করে যে 'তারা অন্যায় করেছে'-

> "আমি চিৎকার করে উঠি। মনে হয় ম্লান জ্যোৎস্না যেন চারদিক থেকে দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। নেমে আসছে একটি ঘন কালো ছায়া। বুঝি আকাশে মেঘ জমেছে। নাকি আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম? কালো ছায়া আমাদের বুকের ভেতর নেমে এসেছে।
> অনেকক্ষণ পর আমরা চারজনই একসঙ্গে বলি, আমরা অন্যায় করেছি।
> আমরা ভীষণ অন্যায় করেছি।
> হাই নিষ্পাপ মন্দিরা-
> হাই-
> নিষ্পাপ-
> মন্দিরা।"[১৩]

চার যুবক তাদের অন্যায় বা অপরাধ পর্যবেক্ষণ করে দেখে যে তারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুযোগ পেয়ে অন্যায় করেছে। তাদেরকে কেউ সুযোগটি তৈরি করে দিয়েছে। গল্পকার এখানে সুযোগ বলতে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রবণতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই সুযোগটি পেয়ে তারা ছেড়ে দেয়নি, এটাই ছিল তাদের অন্যায়। তাই তারা অন্যায় স্বীকার করে বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে অজ্ঞান অবস্থারত মন্দিরাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে শাস্তি দেয়-

> "রাত কত হবে জানিনা আমরা ঠিক করি যে আমরা বাড়ি ফিরব না। আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা মায়েদের আমরা এই মুখ দেখাতে চাই না। আমাদের কিছু হয়েছে ভেবে তাদের বুকভয়ে কাঁপবে। কাঁপুক। আমরা ভাবি এই খারাপ ছেলেদের জন্য তাদের বুকে যেন কোনো মমতা না থাকে।"[১৪]

চার যুবকের শাস্তি তাদেরকে কেউ দেয় নি। নারীর মাতৃসত্তার আলোকিত ছায়ায় নিজেরাই নিজেদেরকে শাস্তি দিয়ে আলো খুঁজে পেতে চেয়েছে। তাইতো আলোচ্য 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে অবক্ষয়িত সমাজের

বিরুদ্ধে তথা তাদের নিজেদের অপরাধপ্রবণতার বিরুদ্ধে তাদের মাতৃত্ববোধের উত্তরণ গল্পটিকে অন্যতম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

**তথ্যসূত্র:**

১। পাল, রবিন সম্পাদনা। সেলিনা হোসেন গল্পসংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৬১।
২। তদেব, পৃ. ২৬১।
৩। তদেব, পৃ. ২৬২।
৪। তদেব, পৃ. ২৬৪।
৫। তদেব, পৃ. ২৬৪।
৬। তদেব, পৃ. ২৬৫।
৭। তদেব, পৃ. ২৬৫।
৮। তদেব, পৃ. ২৬৬।
৯। তদেব, পৃ. ২৬৬-২৬৭।
১০। তদেব, পৃ. ২৬৭।
১১। তদেব, পৃ. ২৬৮।
১২। তদেব, পৃ. ২৬৯।
১৩। তদেব, পৃ. ২৬৯।
১৪। তদেব, পৃ. ২৭০।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১। আনোয়ার, চন্দন সম্পাদক। গল্পকথা। সেলিনা হোসেন সংখ্যা ৬, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রাজশাহী।
২। ইসলাম, আজহার। বাংলাদেশের ছোটগল্প। অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।
৩। পাল, রবিন সম্পাদনা। সেলিনা হোসেন গল্পসংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা।